ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

স্বপন মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

সূচনা কথা

বিদ্যাসাগরের জীবনকথা জানতে এবং জানাতে কার না ভালো লাগে। এই ভালোলাগা থেকেই 'বিদ্যাসাগর' লেখবার সূচনা। বাংলার নবজাগরণের প্রথম আলোর ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত বিদ্যাসাগর। সমাজ ও সময়ের মধ্যে থেকেও তিনি স্বাতন্ত্র্যে কালোত্তীর্ণ। তাই বিদ্যাসাগরের বর্ণময় জীবনকথাকে সেই সময় ও সমাজের সমান্তরালে স্থাপন করে তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য বোঝবার চেষ্টা করেছি। বহু প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক ও মনস্বী ব্যক্তি সে কাজ ইতিপূর্বে করেছেন। কোনো তাত্ত্বিক বিতর্কের জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমি সহজ-সরলভাবে এই ঋজু মানুষটির চরিত্রমহিমা বলার চেষ্টা করেছি। বিদ্যাসাগরের অনন্য চরিত্রের কথা ভাবলে ও বললে মনে পিতৃতর্পণের তৃপ্তি আসে। আজকের দিনের প্রতিনিয়ত স্খলন ও পতনের মধ্যে যখন ব্যক্তির মেরুদণ্ড ক্রমশই নানা আঘাতে ও প্রলোভনে বাঁকা হতে থাকে তখন এই বিদ্যাসাগর চরিত্রের রত্নস্পর্শে মেরুদণ্ড সোজা করে চলবার শক্তি পাওয়া যায়।

'গ্রন্থতীর্থ' প্রকাশনার কর্ণধার শ্রীযুক্ত শঙ্করীভূষণ নায়ক

ব্যক্তিজীবনে কেবল বিদ্যাসাগরের অনুরাগী নন, তাঁকেই জীবনের আদর্শ বলে মনে করেন। তিনি আমাকে বিদ্যাসাগর জীবনকথা লেখবার দায়িত্ব দিয়েছেন। আমি কৃতার্থ, কারণ বিদ্যাসাগরকে জানাতে গিয়ে আমিও আরেকবার নতুন করে তাঁকে জানলাম। প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ড. নিতাই বসুর নির্দেশ ও সহযোগিতা থেকে "বিদ্যাসাগর" রচনাতেও আমি বঞ্চিত হইনি। তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

দীপাবলিতে যেমন অনেক প্রদীপ জ্বলে তেমনি আমার এই ক্ষুদ্র প্রদীপটিও বিদ্যাসাগর-দীপান্বিতায় দীপিত হোক— এই দীন প্রার্থনা।

নভেম্বর ২০০৪

স্বপন মুখোপাধ্যায়

শ্রীবর্ধন পল্লী
পো : জোকা
কলকাতা — ৭০০ ১০৪

সূচিপত্র

ছেলেবেলা	২০
মেধাবী ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র	৩০
ঈশ্বরচন্দ্র হলেন বিদ্যাসাগর—শিক্ষকজীবন	৩৮
শিক্ষা সংস্কার ও বাংলাগদ্য	৫৪
মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন	৬৫
হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফান্ড	৭১
বিধবা বিবাহ	৭৩
বহুবিবাহ ও কুলীনপ্রথা	৯৪
স্ত্রীশিক্ষা	১০৬
বাংলা সাহিত্য ও বিদ্যাসাগর	১১৬
মন্বন্তরে বিদ্যাসাগর	১২৪
তেজস্বীপুরুষ বিদ্যাসাগর	১২৯
দেশান্তরী বিদ্যাসাগর	১৪২
বিদ্যাসাগর-যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও বিদ্যাসাগর-জীবনপঞ্জি	১৫৩

টিপ টিপ করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। সন্ধের মুখেই বোধ হয় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে। আজ আর সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরিতে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না, পুরনো পুঁথিকটা সযত্নে বেঁধে যথাস্থানে গুছিয়ে রেখে ছাতাটা হাতে নিয়ে অধ্যক্ষমশাই চাদরটা সামলে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। যতই ঝড়-বৃষ্টি হোক সংস্কৃত কলেজের এক অসুস্থ ছাত্রের বাড়ি হয়ে যেতে হবে। আজই মাইনে হয়েছে, কাপড়ের খুঁটে সেই পাঁচশো টাকা ভালো করে গুঁজে নিয়েই হন্ হন্ করে হাঁটা দিয়েছেন অধ্যক্ষ মশাই। এই গলিটা দিয়ে গেলেই বোধ হয় ছাত্রের বাড়ি তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। গলিটাতে লোকজন কম। দূরে সদর দরজায় একটি বালিকা দাঁড়িয়ে আছে, বৃষ্টির ছাঁটে তার কাপড় ভিজছে। সদ্যউত্তীর্ণযৌবন অধ্যক্ষমশাইকে দেখে মেয়েটি মিটিমিটি হাসছে। মাথায় একরাশ চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিলেন অধ্যক্ষমশাই। হঠাৎ দূর থেকে মেয়েটিকে দেখে অবাক হলেন। মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে কেন? আর আমাকে দেখে মিচ্‌কি মিচ্‌কি হাসছেই বা কেন? আমাকে চেনে নাকি? কিন্তু অধ্যক্ষমশাই তো চিনতে পারছেন না। কাছে এসে তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন,— মা, তুমি বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন? মুহূর্তে মেয়েটির হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল। সে একদৃষ্টিতে অধ্যক্ষমশাই-এর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, ঠোঁটদুটি কাঁপছে, কথা বলতে পারছে না। চোখ দিয়ে জলের ধারা বৃষ্টির ঝাপটাকে হারিয়ে দু-গাল বেয়ে নেমে আসছে। ছাতা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আটকে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, — মা, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কী হয়েছে?

এবার মেয়েটি হাউ-হাউ করে কেঁদে বলল, —বাবা, তুমি এখান থেকে চলে যাও। এটা খারাপ জায়গা। আমি তোমার নষ্ট মেয়ে বাবা। আমি বুঝিনি, আমায় তুমি ক্ষমা কর।

হঠাৎ যেন মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বাইরেও ভয়ঙ্কর মেঘের গর্জন। অধ্যক্ষমশাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন মেয়েটির মুখের দিকে। এ কে? একি তবে আমার গুরুকন্যা প্রসন্নময়ী? শুনেছি মা-মেয়ে এমনই কোনো খারাপ পাড়ায় আশ্রয় নিয়েছে। না, সে তো নয়। তবে কি আমার শৈশবের সেই খেলার সাথী? না, সেও তো নয়। কিন্তু কী মূর্খ আমি! বৃথাই এ মুখের মধ্যে আপনজনের সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা। এতো আমার বাংলার মেয়ে, বাংলার মা! আমারই মা, আমারই মেয়ে! অধ্যক্ষমশাই-এর দু-চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে। যেন দামোদরের বর্ষার স্রোত।

—ওঠো মা, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছ কেন?

— বাবা, আমাকে আজ পাঁচ-আনা রোজগার করতেই হবে, নইলে এই নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। না-খাওয়া ছোটোবেলা থেকেই অভ্যেস হয়ে গেছে কিন্তু দাঁড়াব কোথায়?

ঝেপে বৃষ্টি নেমেছে। বিদ্যাসাগরের সমস্ত শরীর সেই বৃষ্টিতে ভিজছে, কিন্তু সন্ধের সেই বৃষ্টিধারা বিদ্যাসাগরের গায়ের জ্বালা দূর করতে পারছে না।

—কত হলে তোমাকে আর এখানে দাঁড়িয়ে ভিজতে হবে না?

— পাঁচ-আনা বাবা!

বিদ্যাসাগর কাপড়ের খুঁটের মধ্যে যা বাঁধা ছিল সেই মাস-মাইনেটা মেয়েটির হাতে দিয়ে হুংকার দিলেন— ঘরে যাও। দেখি এই পাষণ্ড দেশের অমানুষগুলোর হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারি কিনা।

মেয়েটি হাঁ-করে দাঁড়িয়ে রইল।

বিদ্যাসাগর আকাশ-চেরা বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন— কোথায় ঈশ্বর? তোমার সন্তানের এই লজ্জা, এই যন্ত্রণা তুমি যদি সহ্য করতে পার, তবে তুমি কিসের জগদীশ্বর! ঝড়ে ছাতা ছিঁড়ে গেছে। সোজা হেঁটে চলেছেন বিদ্যাসাগর। বৃষ্টিরও শেষ নেই, পথও ফুরায় না। কোথায় যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন সব ভুল হয়ে গেছে। শুধু চোখের সামনে ভাসছে অসংখ্য বালবিধবার মুখ। অসংখ্য নির্যাতিতা কুলীন ব্রাহ্মণের বালিকা কন্যার মুখ; তারা নামে সধবা, কিন্তু স্বামী কেমন জানেনা। বাপের বাড়ি থেকে বিতাড়িত। ঘর থেকে পথে, সেখান থেকে এই নরকে।

দ্রুত হাঁটছেন বিদ্যাসাগর। ঝড়ের দাপট বাড়ছে। হাজার হাজার অসহায়া বালিকা যেন একসঙ্গে চিৎকার করে কাঁদছে আর বলছে— বাবা, আমাদের ফেলে তুমি কোথায় চলেছ? একবার আমাদের এই সংসার-নরক থেকে উদ্ধার কর। কে যেন বলল, বাবা এর থেকে আমাদের স্বামীর চিতার আগুন ভালো ছিল। এখন যে চিতার আগুনে ধিকিধিকি জ্বলছি, তাতে তো জান যায় না, কেবলই জ্বলতে থাকি।

বিদ্যাসাগর ঘরে ঢুকলেন। ভিজে জামা-কাপড়েই দাঁড়িয়ে রইলেন দেওয়ালে টাঙানো ছবির দিকে চেয়ে। রাজা রামমোহন রায়ের ছবি। ধীরে ধীরে হাত-জোড় করে ছবিটির দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর জামা-কাপড় ছেড়ে চলে গেলেন পড়ার টেবিলে। আবার পুঁথি নিয়ে বসলেন। সেদিন রাতে আর

কিছু মুখে দিলেন না। গভীর রাত অবধি শুধু পুঁথির পর পুঁথিব পাতা পড়ে যেতে লাগলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝি। ১৮৫০। সে এক ভয়ংকর সময়। বাংলার সব থেকে ভালো আবার সব থেকে খারাপ সময়। পরাধীন দেশ। সমাজের মধ্যে গভীরতম অন্ধকার। অশিক্ষা, ধর্মীয় কুসংস্কার, মনুষ্যত্বহীনতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি। আরেক দিকে ইংরেজ শাসকদের উচ্ছিষ্ট-ভোগের জন্য মেরুদণ্ডহীন পদলোভীর বিবেকহীন চাটুকারিতা, ধনিক শ্রেণির চূড়ান্ত উদাসীনতা ও ব্যভিচার। সমাজে নারীর অবস্থা ভারবাহী পশুরও অধম। আবার আরেকদিকে প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ধর্মের প্রতি ঘৃণা, মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা, নিজের দেশের মানুষদের প্রতিও অবহেলা আর অবজ্ঞা। সেই সঙ্গে চলেছে অন্ধ পরানুকরণ, বিদেশি পোশাক, বিদেশি বুলি, বিদেশি শিক্ষা, বিদেশি আচার— তাকেই মোক্ষজ্ঞান করে ইংরেজের পদলেহন। সমাজনদীর এক পাড় শুধু ভেঙে চলেছে অথচ অন্য পাড়ে গড়ার চিহ্ন নেই।

এমনই এক সন্ধিক্ষণে বাংলার প্রথম স্বাধীনচেতা যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক আধুনিক পুরুষ বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব। বনের মধ্যে সিংহের গর্জন যেমন সমস্ত পশুর ডাককে ম্লান করে দেয় তেমনি ঐতিহ্যসচেতন পুরুষসিংহ বিদ্যাসাগরের জলদগম্ভীর উদাত্ত আহ্বানে বাংলার ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ধর্মীয় কুসংস্কারের অন্ধকার খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল। কে এই স্বাতন্ত্র্যধর্মী, মহাপুরুষ বিদ্যাসাগর?

অষ্টাদশ শতাব্দীতে হুগলি জেলার জাহানাবাদ নামে এক বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের কাছেই ছিল বনমালীপুর গ্রাম। সেই গ্রামে বাস করতেন রামজয় তর্কভূষণ। রামজয় তর্কভূষণের নাতি বিদ্যাসাগর। রামজয় ছিলেন ধর্মপ্রাণ যোগীপুরুষ। ভাইদের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ তিনি

সহ্য করতে পারলেন না। তাই একদিন স্ত্রী দুর্গাদেবী এবং তাঁর দুটি ছেলে ও চারটি মেয়ে রেখে তিনি কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের কন্যা দুর্গাদেবী শ্বশুরবাড়িতে থাকতে না পেরে তাঁর বাপের বাড়ি বীরসিংহ গ্রামে চলে এলেন। বিদ্যাসাগরের ঠাকুমা সেই যে বীরসিংহে চলে এলেন সেইখানে রয়ে গেলেন সারা জীবন। রামজয় তর্কভূষণের বড়ো ছেলে ঠাকুরদাস। বড়ো দুঃখে দুর্গাদেবী তাঁর সন্তানদের প্রতিপালন করেছেন। যাঁর স্বামী নিরুদ্দেশ ভাইদের অভাব-অনটনের সংসারে তাঁর যে কী মানসিক যন্ত্রণা সেই জানে। বাবার উপদেশে বীরসিংহে আলাদা বাসা বেঁধে সন্তানদের বুকে নিয়ে চলে যান দুর্গাদেবী। ঠাকুরদাসের অদম্য চেষ্টা মানুষ হতে হবে। মার চোখের জল মোছাতে হবে। অসম্ভব পরিশ্রমী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ঠাকুরদাস। পিতৃকুল, মাতৃকুল উভয়দিকেই সরস্বতীর কৃপা ছিল, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী বিমুখ। ঠাকুরদাস গ্রামের পাঠশালাতেই সংস্কৃত-চর্চা শুরু করেন, সংস্কৃত ব্যাকরণ অধিগত করে ইচ্ছা আরো পড়েন কিন্তু দারিদ্র্যের অসহ জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন ঠাকুরদাস। ভাই-বোন-মা যেভাবে দারিদ্র্যের পেষণে প্রতিদিন ক্লিষ্ট হচ্ছে তাতে ঠাকুরদাস আর গ্রামে থাকতে চাইলেন না। মার অনুমতি নিয়ে কলকাতা এলেন। কলকাতা শহরে যদি গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারেন তবে একটু পড়তে পারবেন, সেইসঙ্গে রোজগারের চেষ্টাও করবেন। ঠাকুরদাসের বয়েস তখন বছর পনেরো। তাঁদের এক দূর-সম্পর্কিত আত্মীয় ছিলেন কলকাতায়। তিনি বেশ সম্মানিত ব্যক্তি, টাকাপয়সাও আছে। তাঁর নাম জগন্মোহন ন্যায়ালঙ্কার। ঠাকুরদাস কলকাতায় তাঁর দ্বারস্থ হলেন। ন্যায়ালঙ্কার মশাই-এর বাড়িতে আশ্রয় জুটল। দু-বেলা দুটি খাওয়ার তো ব্যবস্থা হল, কিন্তু রোজগার করতে হবে আর পড়াশুনাটাও করতে হবে। ন্যায়ালঙ্কার মশাই-এর চতুষ্পাঠী আছে, সেখানে ঠাকুরদাস ভর্তি হয়ে সংস্কৃত পাঠ নিতে পারেন কিন্তু বছরের পর বছর সংস্কৃত পড়ে পণ্ডিত হয়ে নিজে চতুষ্পাঠী খুলতে পারলে